তিনজন ফরাসী কবি, যাঁরা আমাদেরও

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কাব্য সম্বন্ধে লেখা কাব্য হয় না, সাহিত্য সম্বন্ধে লেখা সাহিত্য হয় না, শিল্প সম্বন্ধে লেখা শিল্প হয় না — জানি। তবু মাঝে মাঝে দেখা গেছে ইতিহাসে, এবং ভবিষ্যতেও দেখা যাবে, কবিরা সাহিত্যিকরা শিল্পীরা নিজেরাই লিখতে বসেছেন কাব্য বা সাহিত্য বা শিল্প সম্বন্ধে, কখনো গ'ড়ে তুলতে একটি তত্ত্ব যাকে তাঁরা নির্বিশেষে আখ্যা দিতে চান দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে, কখনো বা শুধুই আরও জোর স্পষ্ট ক'রে ফুটিয়ে তোলার অভিপ্রায়ে যথার্থ কী বস্তুটি তাঁরা, সেই কবিরা বা সেই সাহিত্যিকরা বা সেই শিল্পীরা, বলতে চান, এবং যেভাবে তাঁরা সেই বস্তুটিকে বলতে পেরেছেন বা বলতে চেয়েছেন, তা এমন একটি বিশেষ দৃষ্টি, অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দর্শন পর্যন্ত, ও ভঙ্গির কাঠামোর মধ্যে পড়ে কি না যাকে বলা যেতে পারে তাঁদের ব্যক্তিগত, তাঁদেরই মৌলিক। এই দুটি অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টার মধ্যে দ্বিতীয়টির পরিব্যাপ্তি লেখার আয়তন দীর্ঘতর ও লেখকদের অনুভবের প্রচণ্ডতায় মহত্তর, এবং সেটাই স্বাভাবিক। কারণ প্রথমত বিশেষকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বিশেষই দাঁড়ায় না, বিশেষের সমষ্টিকে ধ'রেই নির্বিশেষ পেতে পারে একটি সামগ্রিক চেতনা, অন্ত না থাকলে অন্তরের অর্থ তো নেই-ই, সত্তাও নেই। দ্বিতীয়ত, এবং যে কারণটি প্রধান, সকল বিজ্ঞান ও অন্তত আংশিকভাবে সকল দর্শনও যেখানে হ'তে চেয়েছে নৈর্ব্যক্তিক সত্য, কাব্য বা সাহিত্য বা শিল্প, এককথায় সকল শিল্পসৃষ্টি, সেখানে হ'তে চেয়েছে একটি ব্যক্তিবিশেষের অভিব্যক্তি, তার আমি-র আত্মিক চেতনা বা বেদনা বা অভিনিবেশের প্রকাশ। বিজ্ঞানেও, এবং দর্শনে তো বটেই, আজকাল ক্রমশই দেখা যাচ্ছে যে তথাকথিত সেই নৈর্ব্যক্তিকতাটি শেষ পরীক্ষায় একটি নামহীন আপেক্ষিকতার নামান্তর, তাতেও প্রতিফলিত ব্যক্তিগতের চেতনা ও অভিজ্ঞতা। কিন্তু তাতে সেই নৈর্ব্যক্তিক হওয়ার প্রয়াসটি সর্বদাই বর্তমান আছে, এবং তা' খোলাখুলিই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা' যে সত্যটিকে ধরতে চেয়েছে তা' শুধু আমার বা তোমার হবে না, ঐ গাছের, ঐ পাখির, ঐ ধুলোর বা ঐ তারার হবে না, তা' সত্য হবে এই আমাদের, ঐ তাদের সকলের পক্ষে। কাব্য কিন্তু গলা ফাটিয়ে হ'তে চাইল নিতান্তই ''আমার'' ব্যক্তির — কবি বললে ''আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ।'' শিল্পীও তার গায়ের জোরে, বরং তুলির জোরে, ভাঙছে নিরন্তর চেনার পরিচিত আকার, তাকে দিতে একটি আকৃতি, ও প্রকৃতিও, যা তার একান্তভাবে নিজেরই পরিচয়ের, যা তার একান্তভাবে ব্যক্তিগত, আপনার।

অন্যদিকে, রয়েছে নির্বিশেষও — সেই-ই পরম সত্য, অধিষ্ঠিত সকল শিল্প, সাধনার পথের শেষের মন্দিরে। অন্ত বা বিশেষকে থাকতেই হবে সাধনার মাধ্যম ও উপকরণ হিসাবে, কিন্তু তারা কখনোই

সাধনার লক্ষ্য হ'তে পারে না — এবং যদিই বা হয় তো সে সাধনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য অব্যর্থভাবে। চিরকাল তাই দেখা যায় শিল্পসৃষ্টি চেয়েছে সেই নির্বিশেষকে ধরতে, বাঁধতে, প্রকাশ করতে। কবি সাহিত্যিক শিল্পীরাও যখন তাঁদের সাধনার একটি তত্ত্ব খুঁজতে চেয়েছেন বা তাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তখন বিশেষকে প্রায় তুলে ধ'রে দেখতে চেষ্টা করেছেন নির্বিশেষের পরিপ্রেক্ষিতে, দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে।

উক্ত দুটি প্রচেষ্টার প্রত্যেকটিই স্রষ্টার পক্ষে একটি বিধুর, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। সূর্যাস্তকে পাওয়া গেল না, যাবে না, সূর্যাস্তের বিশ্লেষণে। তবে কবিদের সাহিত্যিকদের শিল্পীদের এই যে সমস্ত উক্তি তাঁদের পথ বা সাধনা বা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে, যাকে তাঁরা প্রায়শই তাঁদের তত্ত্ব বা দৃষ্টি বা দর্শন বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন, তা স্বয়ং কবিতা বা শিল্প বা সাহিত্যের সম্পূর্ণতা অর্জন না করতে পারলেও তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ আছে শিল্পচেতনার সমকালীন ও ঐতিহাসিক ধারায় প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, তা' প্রায় সব ক্ষেত্রেই কোনো বিশেষ কবি বা সাহিত্যিক বা শিল্পীর সৃষ্টিসাধনাকে আরো একটু ভালো ক'রে বুঝতে সহায়তা করে। দ্বিতীয়ত, ও মুখ্যত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের নিভৃত কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে এইসব কবির শিল্পী সাহিত্যিকরা মঞ্চের উপর দাঁড়িয়েছেন শুধু নতুন কিছু বলবার তাড়নাতেই, দিতে একটি নতুন ব্যাখ্যা, একটি নতুন ভঙ্গী বা একটি নতুন মর্মার্থ শিল্প সাধনার। এঁদের যে সবাই সব সময় সত্যিই তেমন একটা কিছু নতুন প্রতিপাদ্য নিয়ে পাঠকদের সামনে এসে উপস্থিত হ'তে পেরেছেন, তা' নয়। সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রতিপাদ্যের নাম করে ভুরি ভুরি বহু আবর্জনা ইতিহাস সঞ্চয় করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। প্রাসঙ্গিক যা তা হচ্ছে সেই তাঁদের কেউ কেউ, যাঁদেরও সংখ্যা অনেক, তাঁদের ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণের পথ ধরে কখনো কখনো চেষ্টা করেছেন আকস্মিকভাবে নতুন একটি ব্যঞ্জনা অন্তরের প্রকাশধর্মী প্রচেষ্টার। এই ধরণের ব্যঞ্জনাতে নিশ্চয়ই প্রতিফলিত নানা অর্থে নানা জনে যাকে বলে থাকেন যুগধর্ম, যা একটি যুগের সামগ্রিক চিন্ময় সত্তা এবং যার যথার্থ অনুধাবনের প্রয়োজন আছে ঐতিহাসিকের। কিন্তু ঐতিহাসিক যদি তার মধ্যে শুধু যুগটিকে দেখেই চোখ বন্ধ করেন তো তিনি দেখলেন না তার সব, তার মধ্যে তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে, যুগাতীতের যে গুপ্ত কথাটিও, যা চলে যুগ হ'তে যুগান্তরে, টপকে টপকে, এক যুগে বলা বা লেখা হ'য়ে গেলেও পরবর্তী অন্য যুগ-যুগান্তরে যার ধ্বনি অনুরণিত হ'তে পারে। ফেলে আসা, ভুলে যাওয়া বহু যুগের এই ধরণের কয়েকটি ''নতুন'' ব্যঞ্জনার অনুরণনে আজও সমৃদ্ধ আমাদের জীবন। এরা নতুন, এরা পুরোনো হয় না, কারণ কালস্রোতের সেই বহুকথিত গুণটি যা' বর্তমানকে চিরকালই আধুনিক আখ্যা দেয়, যা' চিরকালই একটা কিছু ফেলে আসছে ও অন্য আরেকটা কিছুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাও ঐ ব্যঞ্জনাগুলির মধ্যে ক্রমাগতই নতুন অর্থ আবিষ্কার করতে পারে, তা' আগামীর রূপায়ণে অজস্র অনুপ্রেরণা পেতে পারে এদেরই মধ্যে।

আমার বর্তমান আলোচ্য তিনজন কবি, যাঁরা ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন যুগের, ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের, ও নিশ্চয়ই ভিন্ন যুগধর্মের। পল ভেরলেন, স্তেফান মালার্মে ও আর্ত্যুর র‍্যাঁবো, এঁরা তিনজন ফরাসী কবি গত শতাব্দীর ও তাঁদের দেশের একটি বিশেষ পর্যায়ের। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে খুঁটিনাটি পার্থক্য নিশ্চয়ই অনেক আছে, প্রত্যেকেই তাঁরা এক একটি দ্বীপ, যদিও সেই পরস্পর হ'তে বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন দ্বীপগুলির তীর ধোওয়া একই সাগরের লোনা জলে। সাহিত্যের ইতিহাস এঁদের তিনজনকে মিলিয়েছে একই পরিচ্ছেদে — তাঁদের পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টির সমতা ও পার্থক্য, দুই-ই একত্রে মিলে তাঁদের সম্মিলিত কাব্যকে দিয়েছে একটি ঐক্যবদ্ধ দর্শন। তাঁদের এখানে একসঙ্গে আলোচনা করার পক্ষে ও যুক্তিটি তো আছেই, কিন্তু তা' প্রাথমিক। অন্য গুহ্য কারণও আছে।

সর্বপ্রধান কারণ হ'ল তাঁদের প্রচণ্ড সমসাময়িকতা, এই আজকেও, এই আমাদের বাংলাদেশেও।

আজকের বাংলা কাব্যের একটি দীপ্তিমান অংশ ক্রমবর্ধমান সচেতনতায় জাগছে দেশ দেশান্তরের ঐতিহ্যের প্রতি — ভেরলেন-মালার্মে -র‍্যাঁবোর নাম ও কবিতা বাঙালি কাব্যরসিকের সুপরিচিত। তা'ছাড়া, এতক্ষণ কিছুটা দীর্ঘ ভূমিকায় যা' বলবার চেষ্টা করেছি, কবিতার আত্মায় সেই নির্বিশেষ ও কবি-বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিগত রূপটির ব্যাখ্যার চেষ্টা এই তিনজনেই অল্পবিস্তর করেছেন, যে ব্যাখ্যায় এমন কিছু প্রতিভাত হয়েছে যা' তার ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনায় আজও সমানই অর্থপূর্ণ ও যা' উদ্দীপ্ত করেছে, করছে সারা জগতের বহু কবিকে। গোড়ায় যদি কাব্য (বা সাহিত্য বা শিল্প) সম্বন্ধে কবিদের নিজেদের লেখার আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি তো তার কারণ শুধু এই যে এই তিন কবি কখনো কখনো তাঁদের নিভৃত আসন হতে বেরিয়ে এসে বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়াতে বাধ্য বোধ করেছেন নতুন কিছু ঘোষণা করার তাগিদেই, জানাতে তাঁদের নতুন অভিজ্ঞতা। বক্তৃতার মঞ্চ অবশ্য কথার কথা মাত্র, তার অর্থ এখানে এই যে এঁরা এঁদের বক্তব্যকে জানাতে চেয়েছেন শুধু কবি হিসেবেই নয়, শুধু কবিতার মাধ্যমেই নয়, কখনো সোজাসুজি বক্তা হিসেবেও, হয় তাঁদের চিঠিতে, নয়তো কথোপকথনের মধ্য দিয়ে, নয়তো বা অন্য কোনো মাধ্যমের মারফৎ আমার আলোচনার বিষয় তাই ততটা তাঁদের কবিতা নয়, যতটা তাঁদের কাব্যদর্শন। যদিও এই দুটির একটিকে আরেকটি হ'তে বিচ্ছিন্ন করা চলে না, তাও মানি।

এই তিনজনের এখানে একত্র করার পিছনে আরো একটি কারণ আছে। যাকে আজ আমরা ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা বলে চিনতে শিখছি ও যে কবিতায় অন্যতম পথপ্রদর্শক এই তিনজন কবি, তা' মূলত বহুলাংশে ঋণী ভারতীয় দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর কাছে। ইতিহাসের এক বিচিত্র উজানস্রোতের মোহনায় ভারত ও ইউরোপ মিলল আবার অনন্তের অভিসারে। এ হচ্ছে আমাদের আগে দিয়ে পরে ফিরিয়ে নেওয়া — তবে ফিরিয়ে নেওয়া আর সেই একই জিনিষ নয়। কারণ সে জিনিষের রূপ বদলেছে যখন তা' প্রথম দেশান্তর পাড়ি দেয়, অর্থাৎ সেই দেশান্তরবাসীদের কাছে, তার রূপ দ্বিতীয় বার পাল্টায় যখন আমরা তাকে আমদানি করে আনলাম আবার। আমাদের বেদনা বা আনন্দ হয়ে গিয়ে দাঁড়াল পাশ্চাত্ত নির্বেদে, এবং সেই নির্বেদকে আজ আমরা আমদানি করছি আমাদের মননশক্তির সীমা ও সমাজগত বা জাতিগত বা ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যের পরিবেশে। সুতরাং এই তিনজন কবি নানাদিক দিয়ে আমাদেরও আজ। উক্ত প্রসঙ্গগুলির প্রত্যেকটিরই আলোচনার প্রয়োজন আছে — কিন্তু আগে আরম্ভ করা যাক একটির পর একটি কবিকে নিয়ে।

ভেরলেন সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে তিনি একজন গৌণ কবি, কিন্তু সেই গৌণতা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর নির্দিষ্ট স্থান ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেনি, বরং যতই দিন যাচ্ছে, কবি হিসেবে তার সামান্যতা একদিকে যেমন বেশি করে ধরা পড়ছে, অন্যদিকে তেমনি তিনি জাগছেন যেন ক্রমশই আরও উজ্জল হয়ে ফরাসী কাব্যের একটি চমকপ্রদ পর্যায়ের এক অন্যতম মুখপাত্র হিসাবে। ফ্রান্সে যে যুগে ভেরলেন জন্মেছিলেন, তার কিছুটা আগে থেকে ও তার কিছুটা পর ক্রমাগতই, এবং তাঁর জীবনকালেও, কবির রসায়নাগারে চলছিল এক যুগান্তকারী পরীক্ষা। কী হবে কবিতার আত্মা, এই ''আমি'' — বস্তুটা শেষ নিরীক্ষণে আসলে কী, কবির সঙ্গে ভিড়ের সম্পর্কটা কোথায় বা কোনো বলবার মত সম্পর্ক থাকতে পারে কি না, অথবা কবিতায় যা বাহ্যিক উপাদান তা কতদূর কবিতার অন্তরাত্মাকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে পারে ও সেই অবয়বের কোন্ বিশেষ রূপটি হবে যথার্থ, এইসব চিরাচরিত প্রশ্ন ও চিরকালের পরম সমস্যাগুলির নতুন নতুন উত্তরের প্রাণান্ত অনুসন্ধানে সেই দেশের ও সেই যুগের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ছিল। ভেরলেনের মাত্র কয়েক বছর আগে এসে গেছেন বোদলেয়ার, এক কবি সিংহ, যাঁর গর্জনের মহিমা তখনো সর্বতোভাবে উপলব্ধ হতে আরম্ভ না হলেও তরুণদের মধ্যে তার একটা অন্তত আংশিক ও অতি আন্তরিক সাড়া জেগেছে — আর এসেছে ভ্বাগনারের অন্য লোকের সংগীতের প্রতি

একটি ক্রমবর্ধমান চেতনা কয়েকটি মুষ্টিমেয় গুণীদের মধ্যে, এসেছে শিল্পের জগতে ''ইম্প্রেশনিজম'' বা বিম্ববাদ। সঙ্গীত ও শিল্পের সঙ্গে কাব্যকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের যুগপৎ মিলনে এক সর্বাঙ্গীণ শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা নেহাত অকল্পনীয় তো নয়ই বরং সাধনার বস্তু, এই অভিনব দৃষ্টি ঐ একই যুগের দান। আজ যেমন করে ইওনেস্কো প্রমুখ বহু উগ্র আধুনিক নাট্যকারেরা প্রকোফিয়েভের সংগীতে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, এক শতাব্দী আগে সেই রকম করেই ফরাসী প্রতীকবাদী কবিতা পেয়েছিল বিজাতীয়কে, অপ্রকাশ্যকে ভ্রাগনারের সঙ্গীতে, ও সেই সঙ্গীতের দ্বারা তা প্রকাশধর্মী প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। অন্যদিকে বিম্ববাদী শিল্প আনল এক নতুন আলোকবর্ষী চেতনা তৎকালীন শিল্পদর্শনের উপর, নতুন এক আলোর খেলায় প্যাঁচে ফেলে তা দ্রষ্টব্যকে দেখাতে চাইল একটি অভিনব আঙ্গিকে ও ভঙ্গীতে, আগের মত আর সরাসরি বা পরিষ্কার ক'রে নয়, কিন্তু এবার আবছায়া মোহিনী মায়ায়, ফুটিয়ে তুলতে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে ততটা আর দেহ বা কাঠামো নয় যতটা দিতে চেয়ে অনুভবের একটি সম্পূর্ণ রূপ দ্রষ্টব্য বস্তু বা বিষয় বা ব্যক্তির একেবারে আত্মাটিকে। এবং বোদলেয়ার স্বয়ং এক নতুন শিল্প আলোচনার ভিত্তি স্থাপন ক'রে গেছেন আগেই।

তবু এ শুধু তখনকার চারিদিকে বহু জানালা খুলে যাওয়ার মাত্র দুয়েকটি দিক। এবং দিক ফলের, কারণের দিকটা নয়। কারণের দিকে ছিল তৎকালীন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তায় অনেক গৃহীত সত্যের প্রায়-রাতারাতি ওলটপালট, যা' এতদিনকার নিস্তরঙ্গ হ্রদের জলে সহসা যেন এনে দিল সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ। এই জাগরণের সম্পূর্ণ কোন ছবি দেওয়া অসম্ভব, এবং সেই ছবিটি জটিল, তা' বিস্তৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু শাখা-প্রশাখায়, বিধৃত বহু ব্যক্তি, বহু সমষ্টি ও বহু খুঁটিনাটিকে আঁকড়ে । তা'ছাড়া, এর সবই ঘটেনি একই সঙ্গে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের সীমার মধ্যে, কিন্তু ঘটে গেছে, ক্রমাগতই, আজো ঘটেছে — এ অজস্র বক্র রেখার একটি সমষ্টি যা' বহুমুখী ও বহু বছরের সাধনায় প্রসারিত। আর, সেই ছবিটির সম্পূর্ণ আয়তন সম্বন্ধে আমার নিজের জ্ঞানের সীমাও সংকীর্ণ, শুধু তার সামগ্রিক সত্তা যদি কিছু থেকে থাকে, অন্তত যেভাবে আমি তাকে গ্রহণ করতে পেরেছি বলে মনে করি, সেইভাবে সেই সত্তাটিকে সংক্ষেপে দেখানোর চেষ্টা করছি এখানে। আমাদের অল্প পরিচিত নাম ও ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনায় পাছে বক্তব্য অযথা ভারাক্রান্ত হয়, যে নাম বা যে-ঘটনাটি না উল্লেখ করলেই নয়, শুধু সেই সারটির কথা এখানে আলোচনা করছি।

ভেরলেন, ও একই অর্থে মালার্মে এবং তাঁদেরও আগে বোদলেয়ার ও বোদলেয়ারেরও আগে আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিকরা, প্রধানত যার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে বাধ্য বোধ করেছিলেন তা' হচ্ছে সেই যুগের ''পজিটিভিজম'' বা প্রত্যক্ষবাদের দর্শন। কী নীতির ক্ষেত্রে, কী কাব্যে বা শিল্পে, কী সমাজ-চিন্তায়, প্রত্যক্ষবাদীরা ভেবেছিলেন তাঁরা অবশেষে সমস্ত রহস্য সমাধানের শেষ চাবিটি খুঁজে পেয়েছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন এই জগতকে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পরিষ্কার প্রাঞ্জল ভাষায়, জেনেছিলেন যে সবই নিশ্চয় ব্যক্তের সীমার মধ্যে। থাকতে পারে না আর অসীম, আর অব্যক্ত, আর রহস্য — এই ছিল তাঁদের বক্তব্য। কিন্তু ক্রমশই দেখা যেতে লাগল রহস্য সর্বত্রই রয়ে যাচ্ছে, অসীম রয়ে যাচ্ছে, অব্যক্ত রয়ে যাচ্ছে। তরুণ বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই আর সান্ত্বনা পেলেন না প্রত্যক্ষবাদে — তাঁরা মেনে নিতে চাইলেন অবোধ্যকে, অপ্রকাশ্যকে, অসীমকে। কিন্তু সেই অপ্রকাশ্যকে কী ভাবে প্রকাশ করা যাবে, অব্যক্তকে কী ভাবে ব্যক্ত করা যাবে? তবু তাই-কি নয় শিল্পের ক্ষুরস্য ধারার সাধনা যুগযুগান্ত ধরে, চিরকালের? তাই এই নতুনরা দেখলেন এবার যে চাই এক অন্যরকমের আঙ্গিক, সাধনার এক অন্যরকম অস্ত্র। ভেরলেন বললেন, আর রঙ নয়, শুধু আভাস লাগাও। কারণ একমাত্র আভাসেই হয়ত সম্ভব হবে সূক্ষ্মতম অনুভূতির অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা। কাব্যকে হতেই হবে একটি সম্পূর্ণ উক্তি, পরমের বা

অব্যক্তের দিগন্ত-ছোঁওয়া। তাই বোদলেয়ার চাইলেন একটি ''সম্মিলন'' বা ''সংযোগ'', যাতে বাঁধা পড়বে ঐক্যের সুরে সমস্ত ইন্দ্রিয় চেতনার একতান ঝংকার, যাতে সংগীতের উপাদানে কাব্য হবে সমৃদ্ধ। সব ছেড়ে সংগীত কেন? কারণ সংগীতেরই মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে এমন একটা কিছুর প্রকাশের চেষ্টা আছে যা' সকল ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

অবশ্য প্রত্যক্ষবাদ মরেনি তো এত তাড়াতাড়ি। পরে, সময়ের স্রোতে গড়িয়ে, তা' নাম নিল ''ন্যাচারালিজম'' বা প্রাকৃতবাদের — সে যুগের বহু উপন্যাস-নাটকে তার দর্শনের জয় ঘোষিত হতে থাকল। কিন্তু, একই সঙ্গে, বিরুদ্ধ দলের মধ্যেও পড়েছে সাজ-সাজ রব, এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই নাম করবার মত অনেক তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের বিক্ষুব্ধ অন্তর সমুদ্রের গর্জন শোনাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে। অল্প কথায় পরিষ্কারভাবে কী করে এটিকে বলা সম্ভব হবে জানি না, তবে এই নতুনরা তাঁদের সংগ্রামে যে একটি অশ্রুতপূর্ব অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হলেন, তা' আন্তরিকতার প্রচণ্ডতায় ও অনুভবের মাহাত্ম্যে তাঁদের আজও নমস্য করে রেখেছে ইতিহাসে। সকল সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটি অবিস্মরণীয় পর্যায়, এর বিশিষ্ট কাব্যে ও শিল্পে সেই মহান অন্তর্দ্বন্দ্বের বুক-ফাটা রক্তের স্বাদ।

এক স্বাভাবিক অসন্তোষ তো ছিলই প্রত্যক্ষবাদীদের সকল রহস্য উড়িয়ে দেওয়া ব্যাখ্যায়, যে-ব্যাখ্যা বোঝাতে পারল না মানুষের অন্তের অভীপ্সা ও হতাশা-নিরাশার সবটুকুকে। কিন্তু বিজ্ঞানও হাতে হাত মেলাল এই অসন্তোষের। বৈজ্ঞানিকরাও দেখতে আরম্ভ করলেন যে রহস্যকে যতই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা যায়, সে ততই মাথা তুলে দাঁড়ায় অনন্ত আকাশে। তারপর রয়ে গেছে শুধু দৈনন্দিনের তুচ্ছ অনেক কিছু অবোধ্যই নয়, মানুষের আধ্যাত্মিক কৌতূহলও, যা' সব সময় ব্যবহারিক যুক্তির কথায় ওঠে-বসে না। আধ্যাত্মিকতা? — তা' তো বিলাস মাত্র, প্রত্যক্ষবাদীরা বললেন নাক সিঁটকে। কিন্তু তার প্রতি মানুষের কৌতূহলটিকে তাঁরা দমাবেন কী করে? ১৮৭১ সালে ফ্রান্সে স্বনামধন্য দার্শনিক স্পেনসারের একটি প্রভূতভাবে বিদীত ও আলোচিত বইয়ের অনুবাদ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই তরুণদের দল তার মধ্যে দেখল তাদেরই ধ্যান ধারণার স্বীকৃতি। লোকে সান্ত্বনা পেল জেনে যে অজানা বলেও, অজ্ঞাত ও অজ্ঞের বলেও একটা বিরাট, প্রধান জিনিষ থাকতে পারে। প্রত্যক্ষবাদীদের এক মাননীয় গুরু ছিলেন কঁত, স্পেন্সার আবার প্রথম হতেই সেই কঁতের মহান প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর অন্যতম প্রতিপাদ্য হল : যে শক্তি নিয়তই রূপ দিচ্ছে এই বিশ্বজগতকে, তা' আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অভেদ্য, আমাদের বোধের অগম্য চিরকালের জন্যে তা'। নতুন দলের মহারথীরা বিস্ময়ে বললেন, বাঃ, কী চমৎকার, কী সত্য কথা!

ধীরে ধীরে অজ্ঞেয় হতে এল গুপ্তের গুহ্যের চেতনা। প্রাচ্য দর্শন ও চিন্তার অধ্যয়নও তখন আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় দর্শন প্রেমিক শোপেনহাওয়ারের বাণী ঔৎসুক্য জাগিয়েছে, যে বাণী প্রত্যক্ষবাদীদের ভ্রূক্ষেপ না করে বলল জগতটা মায়া, তার সব কিছু রূপ পেয়েছে এক গুপ্ত, অজ্ঞেয় অপরূপ হতে। এমনি করেই আরম্ভ হল একটি নতুন আদর্শবাদের ভিত্তি স্থাপন। এসবেরও বহু আগে থেকে ভারতের সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অনুবাদ বেরোতে আরম্ভ হয়েছে ফরাসী ভাষায়। সেখানকার জ্ঞানী-গুণীদের অনেকেই পড়েছেন গীতা, ভাগবত, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত। ১৮৪৫-এ ফ্রান্সের বিশিষ্ট ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞ বুরনুফ তাঁর বুদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। বহু কবি, বোদলেয়ারের আগেও, ভারতীয় দর্শন হতে সাক্ষাৎ অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এমনকি র‍্যাঁবোর সঙ্গেও গীতা ও উপনিষদের সম্পর্ক কিছু আছে কি না, তা' নিয়েও অপেক্ষাকৃত সম্প্রতি অতি বিশদ আলোচনা হয়ে গেছে। এই সব আলোচনায় প্রায়ই যে অত্যুক্তি থাকেনি, এমন নয় — যেমন রলাঁদ্য রনেভিল একটি সাম্প্রতিক দীর্ঘ নিবন্ধে প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে র‍্যাঁবো ও ভারতীয় চিন্তাধারা প্রায় একেবারে একাত্ম — তবে এই ধরনের অত্যুক্তিও শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে প্রাচ্য চিন্তাধারা প্রায় বিশেষত ভারতীয় চিন্তাধারা

অনেকাংশে ও অন্তত পরোক্ষভাবে রূপ দিয়েছিল এই নতুনের আদর্শবাদকে, ও তাকে প্রত্যক্ষভাবে সংকীর্ণ গণ্ডী হতে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। ভারতীয় বেদনা বা আনন্দ আর সেই যুগের (অনেকখানি আজকেরও) ফরাসী নির্বেদ এক বললে হয়তো বেশ একটু বাড়াবাড়ি করা হবে তবে সেই নির্বেদের যে আধ্যাত্মিক রূপটি কবিরা দিতে চেয়েছিলেন, তা' কম অনুপ্রেরণা পায়নি ভারতীয় অব্যক্তের অভিব্যক্তি হতে।

এক কথায়, যখন চিন্তা ও দর্শনের জগতে এইরকম একটি বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, এক নতুন জাগরণের আবহাওয়ায় সারা দেশটা গমগম করছে, তখন এলেন ভেরলেন। পুরোনো ও নতুন, এই দুইয়ের দুটি বিপরীতধর্মী স্রোতের সংঘাতে পড়ে তাঁর জীবন — ব্যক্তিগত ও কবির, দুইই — বহু ক্ষতচিহ্ন সঞ্চয় করেছে। তবু, কখনো সন্দেহে, কখনো অটুট প্রত্যয়ের দৃঢ়তায়, তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়ে যেতে পারেন আগামী দিনের ইঙ্গিত।

পল ভেরলেন বেঁচেছিলেন বাহান্ন বছর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তিনি বেঁচেছিলেন দুই যুগে, বরং দুই যুগধর্মের আলোছায়ায় দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতিতে। তাঁর জীবনের গোড়ায় ফরাসী কাব্যে চলছিল পারনাসদের রাজত্ব, এবং তাদের সে আন্দোলনে তিনি নিজেও কিছু সামান্য অংশগ্রহণ করেননি। তবে ধীরে ধীরে, তাঁর অনুবর্তী ও অন্যান্য অনেক তরুণ সমসাময়িকদের মত, তিনিও আবিষ্কার করলেন যে পারনাসদের দম্ভ মিথ্যা, তাঁদের কবিতার ঐশ্বর্যশালী ছন্দ ও তথাকথিত সার আকারের মধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে অনুপস্থিত রয়ে গেছে সেই ব্রহ্মাস্ত্র যা' ফরাসী কবিতাকে একটি সম্পূর্ণতার শৃঙ্গে দাঁড় করাতে পারে। অতএব রোমান্টিক বিপ্লব তো বহু আগেই পথ দেখিয়ে দিয়েছে, বলেছে যে কবিতাকে মুক্তি দিতে হবে প্রাচীন রীতি-নীতির কারাগার হতে — এগোনো যাক না তাই এখনো সেই একই মুক্তিকামী ও মুক্তিদাতা পথ ধরে, ক্রমশই এক বৃহত্তর ও মহত্তর প্রাণচেতনার উদ্দেশে! এছাড়াও, ভেরলেনের কিছু আগেই ফরাসী কাব্যে ঘটে গেছে এক অভাবনীয়, অকল্পনীয় প্রচণ্ড বিপ্লব : বোদলেয়ারের আবির্ভাব। সেই বোদলেয়ার পাপের মধ্যে বেঁচেছেন সহজিয়া তান্ত্রিকদের মত, সাধকের উদ্দীপ্ত অভীপ্সায়, তিনি পাপকে ফুলে পরিণত করেছেন ও সুন্দরের মানসের মধ্যে পাপবোধকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন একটি অভিনব সৌন্দর্যতত্ত্ব। শুধু তাই নয়, পরবর্তী প্রতীকবাদী কবিতার ভিত্তিস্থাপনও তিনি করে গেছেন ''সংযোগ'' সনেটটি লিখে। নির্বেদকে তিনি দিয়েছেন আধ্যাত্মিক, অব্যক্তের রূপ।

তাই দেখি বাইশ বছর বয়সে প্রকাশিত ভেরলেনের প্রথম কবিতার বইটিতে এই দুটি বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ধারার ছাপ : একটি প্রেরণা পেয়েছে বোদলেয়ার হতে, অন্যটি অনুগতের মত অনুসরণ করেছে পারনাসদের আঙ্গিক ও দৃষ্টিভঙ্গী। বইটির নামকরণেই তো বোদলেয়ারের অবিসংবাদিত প্রভাব — ''শনির কবিতা''। অন্যদিকে, সেই একই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতার মধ্য দিয়ে, কবি কখনো ছুটেছেন তথাকথিত ''উদ্দীপ্তদের'' বলি দিতে মিলো-র ভেনাসের পায়ে, ভেনাসের যে-প্রস্তর মূর্তিটি তখনকার দিনে হয়ে দাঁড়িয়েছিল নতুন শ্রম ও প্রতিজ্ঞার প্রতীক; কখনও বা কবি ল্যকঁত দ্য লিলের মত লিখতে বসেছেন একটি ''হিন্দু কবিতা'', ভাবটা যেন ইতিহাসের কোনো ঝকমকে পাতা হতে সদ্য তুলে আনা; কখনো বা তিনি ঘোষণা করছেন যুগের ব্যবহারিক, অনুসন্ধিৎসু চিত্তবৃত্তির প্রতি তাঁর বিজাতীয় ঘৃণা। এর সব কিছুতেই প্রতিফলিত পারনাসদের বিশিষ্ট প্রতিপাদ্য ও ভঙ্গী। তবে ঐ একই বই-এ আবার আরও অনেক কবিতা আছে যা' বলছে নির্বেদের কথা, কথা অন্তর্গ্লানির অথবা নামহীন বিষণ্ণতার, যাতে চিত্রিত হয়েছে পারী-র ধূসরতা কিংবা কোনো প্রান্তরের বিধূরতা, তাতে আছে উগ্রকে, বিশ্রীকে আবাহন। ছন্দও বহুক্ষেত্রে যেন সংগীতের মৃদু মূর্ছনাকে ধরতে চায়। এই দ্বিতীয় ধরনের কবিতাগুলোতে বোদলেয়ারের প্রভাব অনস্বীকার্য, শুধু তাতে যা নেই তা' হচ্ছে বোদলেয়ারের অকৃত্রিম গাম্ভীর্য ও তাঁর গ্লানির চেতনার

অতিরিক্ত তিক্ততার মাধুর্য। তুচ্ছের মধ্যে এখানে শুধু ভেরলেন ফুটিয়ে তুলিতে চেয়েছেন যে গ্লানি গুপ্ত, মন খারাপের — যেটি ভেরলেনের বিশিষ্ট সুর তাঁর অন্যান্য কাব্যেও। তিনি চেয়েছেন প্রকাশ করতে ''কাব্যিক এক প্রেম, যে প্রেম ভাবুক, যে প্রেম আধুনিক, তার অভীপ্সার ও যার মাথায় বিষণ্ণতার মুকুট।"

এই ধারাতেই চলছিলেন ভেরলেন ও এগোচ্ছিল তাঁর কাব্য, যতদিন না তাঁর জীবনের মহত্তম ঘটনাটি দরজায় এসে ধাক্কা দিল অপ্রত্যাশিতভাবে। সেটি হচ্ছে তাঁর জীবনে কিশোর র‍্যাঁবোর আবির্ভাব, প্রথমে পাগল-করা পরম সখারূপে, পরে শত্রুর ছদ্মবেশে। এই ঘটনার কিছুকাল আগে হতেই ভেরলেন মেতেছেন মদের নেশায়, বেশ্যাবাড়ী যাওয়ায়, বহন করছেন ছন্নছাড়ার জীবন। শৃঙ্খলা নেই, ইপ্সিত স্বাদটি অনুপস্থিত, কী যেন একটা অজানার আবেশ ও আগমনীতে ইতিমধ্যেই দুলছে মন। র‍্যাঁবো এলেন যথার্থ ডাকটি নিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রার। র‍্যাঁবোর এই আগমনে তাঁর জীবনটাই গেল পালটে, তা' যেন মুহূর্তে ছিটকে বেরিয়ে গেল তাঁর এতদিনের অতি পরিচিত, মরচে-পড়া পরিবেশের কেন্দ্র হতে। র‍্যাঁবো তাঁকে করে তুলতে চাইলেন এক ''নারকী প্রেমিক", তাঁকে জ্বলিয়ে দিতে চাইলেন এক অভাবনীয় আদর্শের বহ্নিতে, চাইলেন তাঁর কল্পনায় এক নতুন দৃশ্যের জগতকে সৃষ্টি করতে। তাঁকে র‍্যাঁবো করতে চাইলেন সর্ব অর্থে এক অতিমানব, তাঁর মননশক্তি ও চেতনার গণ্ডীটিকে নিজের শক্তিতে মুছে দিয়ে, তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর অতীত ও বর্তমান হতে।

পাগল হওয়ার সোজা, কিন্তু ভেরলেন পারলেন না র‍্যাঁবোর ওই আদর্শে উঠতে, এবং অচিরেই একদিন ব্রাসেলসে তাঁদের পরস্পরের হতাশা ও অন্তর্বিক্ষোভ এমন চরম মনোমালিন্যের রূপ ধরল যে ''নারকী প্রেমিক" তাঁর দয়িতকে রিভলভারের গুলিতে আহত করলেন। আহত, ক্ষুব্ধ ও অন্তর্গ্লানিতে জর্জর র‍্যাঁবো চিরকালের জন্য ছাড়লেন ভেরলেনকে, এবং অল্পকাল পরে কাব্যজগত থেকেও বিদায় জানিয়ে দেশান্তরী হলেন সম্পূর্ণ এক নতুন জীবন আরম্ভ করতে চেয়ে।

এর পর ভেরলেনের জীবনটা পড়ে রইল, যে কটি বছর তিনি আরো বেঁচেছিলেন, এক ঝলসে-যাওয়া স্বপ্নের মত। র‍্যাঁবোর প্রভাব তাঁর কাব্য দর্শনের উপর রয়ে গেল প্রচণ্ডই, তবু তাঁর ছিল না র‍্যাঁবোর মত আশ্চর্য ছবি সৃষ্টি করার ক্ষমতা। শুধু তাঁর কাব্যে ফুটল আরো তীব্র হয়ে আগের সেই বিচিত্র ধূসরতার আবেশ, এক নিরন্তর সংগীতের মূর্ছনা ও বিষণ্ণতা, পাপের চেতনা, ও এক নামহীন বেদনা অব্যক্তের। তাঁর মত এমন করে বোধহয় আর কোনো জীবনই কখনো চেষ্টা করেনি পরস্পরবিরোধী বহু স্রোতকে মরিয়া হয়ে একাভিমুখে করতে। তাঁর শেষের দিকের কাব্য ক্রমশই হচ্ছিল, আত্মায় ও আকারে, প্রতীকবাদী কবিতার পূর্বসূরী, যদিও র‍্যাঁবোর প্রতিভার অতি বিলম্বিত খ্যাতি ছড়ানোর পর তিনি অনেকখানি নিষ্প্রভ হয়ে যান।

ঐ পরস্পরবিরোধী স্রোতের প্রসঙ্গে আর ছিল তাঁর মাঝে-মাঝের চরম ক্যাথলিকতা, যা' যখন জেগেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বা কাব্যে, বৃথাই যুদ্ধ করতে চেয়েছে তাঁর স্বভাবগত দুর্নীতিপরায়ণতার সঙ্গে। বার বার এই যুদ্ধে জয় হয়েছে তাঁর মদের নেশার, উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি তাঁর উৎকট প্রেমের। অবশ্য এক অর্থে সেই দুর্নীতিপরায়ণতাও কথার কথা মাত্র ও আপেক্ষিক। সাধারণ অর্থে আমরা যাকে পাপ বলি, তা' সাধনার অঙ্গীভূত হলে কতখানি আর পাপ থাকে জানি না।

কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, যা-এখানে আমাদের প্রধান বক্তব্য বিষয়, ভেরলেন বিচ্ছিন্নভাবে অনেক বললেও তাঁর বিখ্যাত ''কাব্যপ্রকাশ" বা Art Poetique গ্রন্থেই সেই ভাবগুলিকে তিনি প্রথম গুছিয়ে একত্র করলেন। প্রকাশকাল ১৮৮৪ সাল হলেও গ্রন্থটি লেখা হয় বহু আগে, প্রায় একই সময়ে যখন র‍্যাঁবো লিখেছিলেন তাঁর ''দ্রষ্টার" চিঠি। র‍্যাঁবোর প্রতিভা ছিল অনেক বিরাটতর, তাই তিনি দেখেছিলেন ও দেখাতে চেয়েছিলেনও যে-আলো অতলান্ত গভীরের, এবং যে গভীরে ভেরলেন নিশ্চয়ই পারেননি

প্রবেশ করতে। তবু ভেরলেন উক্ত বইটিতে কিছু সার তত্ত্ব খাড়া করেছেন, যা' তার নিজের অধিকারে স্থান পেয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে ও যাতে নিঃসংশয়ে ধ্বনিত আগামীর প্রতীকবাদের বহু বিশেষ প্রতিপাদ্য। কবিতা, ভেরলেন বললেন, শুধু এক চমৎকার কারুশিল্পই নয়, তা' শুধু আঙ্গিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে মুখর হওয়ার ক্ষমতারই প্রকাশ নয়, তা' যেন ব্যক্ত করতে উদ্বুদ্ধ হয় তাকেও যা' কেবল আভাসের ও সূক্ষ্ম চেতনার, যা' গুপ্ত। তা' যেন মানুষের অনিবার্য আন্তর গ্লানিকে, অশান্তিকে, দুরন্ত স্বপ্নকে ধরতে পারে। তা' যেন পাঠকের চিত্তে জাগাতে পারে সেই মধুর রিক্ততার অনুভবটি যা' আগে ছিল কবিরই ব্যক্তিগত সম্পদ। ভেরলেনের মাহাত্ম্য যদি কিছু থাকে তো তা' এখানেই : তিনি নতুন পথের সাধনাকে নমস্কার করে গেলেন, তার কয়েকটি অতি আবশ্যক অঙ্গের সুস্পষ্ট ইংগিতও রেখে গেলেন।

স্তেফান মালার্মে বেঁচেছিলেন ১৮৪২ হতে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত। তিনি তাই ভেরলেনের সম্পূর্ণ সমসাময়িক — তবু চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্যে কী বিরাট পার্থক্য তাঁদের দুজনের! কবি হিসেবেও মালার্মে এক সত্যিকারের মহারথী, যদিও তিনি লিখেছেন খুবই সামান্য, তাঁর সবকটি উল্লেখযোগ্য কবিতাই ছোট আকারের, সংখ্যায় গোটা ষাটেকের বেশি নয়, যা যথেষ্ট একটি চটি বইয়ের পক্ষে। তাই দিয়েই তিনি মৃত্যুঞ্জয় এক স্বাক্ষর আঁকলেন ইতিহাসে। তবু যা' তাঁর সবচেয়ে বড় দান, তা' তাঁর কাব্যিক দর্শন, যা' তার অভিনবত্বে যেমন মৌলিক, পরবর্তীদের প্রভাব করার ক্ষমতায় তেমনি প্রচণ্ড বলে প্রমাণিত।

ভেরলেনের মত প্রথম হতেই, যখন তিনি কবিতা ছাপাতে আরম্ভ করলেন ১৮৬০ নাগাদ, মালার্মের ওপর দুটি বিশিষ্ট ধারার ছাপ, একটি পারনাসদের, অন্যটি বোদলেয়ারের। শুধু, পারনাসদের প্রভাব প্রসঙ্গে, তিনি অগ্রজ ল্যকঁত দ্য লিলের পথ ধরলেন না, লিখলেন না এপিক-ধর্মী গাথা, ''হিন্দু কবিতা'', চিরাচরিত বিরাট দার্শনিক প্রতিপাদ্যে ভারাক্রান্ত করলেন না তাঁর বক্তব্য। উল্টে তিনি নিলেন তেওদর দ্য বাভিল-এর পথ, পারনাসদের পূজ্যপাদ অন্য এক অগ্রজ কবি, যিনি মালার্মেকে উদ্বুদ্ধ করলেন স্বাস্থ্যের সুখ ও বাঁচাবার আনন্দে, সৃষ্টি করতে স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ছবি খেয়াল কল্পনার, প্রকাশ করতে ইন্দ্রিয়চেতনার সহজ খুশী ভাব। ওদিকে বোদলেয়ারের প্রভাব মালার্মেকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল একই সঙ্গে অতি বিপরীত স্রোতে, তাঁর মধ্যে জাগাতে জ্বলন্ত অনুভূতি রোগের, যন্ত্রণার, দুঃখের দারুণ সৌন্দর্যের, তাঁকে জাগাতে মরিয়ার তুরীয় অবস্থায়, সকল ইন্দ্রিয়ানুভবের এমন একটি সূক্ষ্ম ও সামগ্রিক চেতনায় যা' যেমন জটিল ও অবোধ্য, প্রকাশ পেতে চেয়েও তেমনি নাছোড়বান্দা। অবশ্য, বোদলেয়ারের প্রভাবটিই এখানে একেবারে গোড়া হতে গভীরতর — মালার্মের প্রথম দিকের কবিতাতেও বিষয় বহু ক্ষেত্রে সেই একই : উঠবার চেষ্টা একটি অসম্ভব আদর্শের উদ্দেশ্যে; বেশ্যা, যে দুঃখের কন্যা, আনন্দের নয়, পার্থিব পাপের বোঝা যার ঘাড়ে; যে ঘন চুলের কালো গন্ধে মত্ততা জাগে; যার আবাহন শয়তানের। লেখার বাহ্যিক ধরণেও, যেমন কখনো কখনো গদ্য কবিতায়, বোদলেয়ারের সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি।

তবু বোদলেয়ার হতে তাঁর পার্থক্যও অতি পরিষ্কার, এবং তাও একেবারে গোড়া হতেই। মালার্মের প্রকাশ যেন আরও অনেক বেশি পূত, অনেক বেশি আদর্শবাদী, বিদ্ধ অনেক তীক্ষ্ণতর বুদ্ধির দীপ্তিতে। বোদলেয়ারের ''পাপের ফুলে'' তিনি বিশেষ করে যা দেখলেন ও যাতে অনুপ্রেরণা পেলেন তা' হচ্ছে এক নতুন ছবির জগত ও আভাসের এক বিচিত্র, গুপ্ত আবেশ। কিন্তু ছবির সৃষ্টিতে তিনি গেলেন না একেবারেই বোদলেয়ারের মত। তিনি তাঁর ছবিদের শাসন করলেন না, তাদের বাঁধতে চাইলেন না কোন দৃঢ় শৃঙ্খলায়, একই কবিতায় এক ছবি হতে আরেক ছবিতে যেন যথেচ্ছ লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন। আসলে ছবির প্রতি প্রেম ছিল তাঁর এত প্রচণ্ড যে সেই ছবির সৃজনে কোনো পরম্পরা রক্ষা করার বাধ্যবাধকতাতে তিনি নিজেকে বাঁধতে চাননি। কারণ ছবি যে প্রতীক মাত্র, সে শুধু নানারঙের জামাকাপড় পরে প্রতিনিধিত্ব করে বেড়ায় এক অন্য কিছুর। এবং সেই অন্য কিছুটি হচ্ছে ''ভাব'' বা

''আইডিয়া'', যে একমেবাদ্বিতীয় ও যে-ই একমাত্র পরম লক্ষ্য। ছবির কাজ তাই প্রতীকের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটিকে প্রকাশ করা তার চরম নগ্নতায়। ছবি যেন তার নিজের অন্তহীন মিছিলের মধ্য দিয়ে সেই তাকে দেখাতে পারে যা' গোপনে ব'সে আছে ও যা' সকল ছবির অতীত। এবং এই জাদু ঘটাতে পারে একমাত্র কবি তার জাদুকরী প্রতিভার শক্তিতে, যেন নিমেষে একটি সোনার কাঠির ছোঁওয়ায়, ও তার এক অন্যতর নির্মম নির্ভুল শৃঙ্খলার অভিনিবেশে। কবি তাই ধরতে পারে যে কোনো ছবি যে কোনো প্রতীক; এমনকি দৈনন্দিন যে কোনও তুচ্ছ ঘটনাও — যেমন, এক মেলাতে একটু বেড়িয়ে আসা, বা একটি অপ্রত্যাশিত দেখার আলোকে উদ্ভাসিত কোনো অপরিচিত নারীর মুখ, যাত্রার অন্তরালে দুই একটি দণ্ড কাটানো কোনো পান্থশালায় বা রেলষ্টেশনে, অথবা কোনো নর্তকীর একটি মুহূর্তের উদ্ধত ঊরু, কিংবা শূন্য কোনো ফুলদানি বা একটি হাত-পাখা, অথবা আগে-শোনা কোনো এক দুর্বোধ্য বাক্য যা' মাথায় কেবলি ঘুরে ঘুরে মরছে, ইত্যাদি ইত্যাদি — সকলই সার্থক বিষয় হতে পারে কবিতার, কিন্তু তা' হবে না কবিতার যথার্থ প্রতিপাদ্য।

মালার্মের এই ভাব ধারণার সঙ্গে পরবর্তী প্রতীকবাদের সম্পর্কটি যে কত অন্তরঙ্গ, তা' বলাই বাহুল্য। এবং এর সঙ্গে ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রেরও একটি সদৃশ মিল যেন আছে কোথায়। হেগেলের দর্শনের সঙ্গে বিশেষ করে এর মিল আছে, যার দার্শনিক তত্ত্বকে ফ্রান্স তখন সবে গভীরভাবে জানতে আরম্ভ করেছে। হেগেলের প্রতিপাদ্য ছিল যে সত্তা বা ''রিয়্যাল'' ও কারণ বা ''লজিকের'' দুটি আপাত ভিন্ন স্তর এক হয়ে মেশে এক উন্নততর স্তরে যার নাম ভাব বা ''আইডিয়া'' এবং যা-ই একমাত্র সত্য। মালার্মের তপস্যা ছিল সেই শেষ ও পরম ভাবটিকে ধরার, তাকে প্রকাশ করার, নিজের মধ্যে জগতকে নতুন করে তৈরী করার ও তার যথার্থ সত্য রূপটিকে দেখানো প্রতীকের আলোছায়ার ঢাকনাটির স্তরটিকে ভেদ করে। অনেকটা যেন ঈশোপনিষদের হিরন্ময় পাত্র ও তার দ্বারা আবৃত ও তাতে নিহিত সত্যের প্রসঙ্গ এইখানেও। লেখা মানেই, মালার্মে বললেন, জাগা — ''সাদার ওপর সারি সারি কালো অক্ষর যেন কোন তমসাঙ্কিত ফিতার গভীরের ভাঁজ, যা' ধরে রাখে অনন্তকে।'' লেখা তাই এমন একটি প্রচেষ্টা যা' যে রহস্য আমাদের সকলকে ঢেকে রেখেছে, তাকে সে উত্তোলিত করে। মহাজীবনের অধিকারী যে মানুষ, যে মানুষ মহানগরীর, তার প্রয়োজন আছে এই প্রয়াসের।

বোদলেয়ারের মত মালার্মেও এক ''সংযোগ'' চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সংযোগ এর চেতনাটিকে তিনি ঠেলে নিয়ে গেছেন আরও ঊর্ধ্বে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির তরাই প্রদেশ হতে শুদ্ধ বুদ্ধির তুঙ্গ শৃঙ্গে। কবিতার বাহ্যিক অবয়ব বা ভারতীয় আলংকারিক অর্থে যাকে রীতি বলা চলে, সেই বিষয়েও তাঁর অবদান সামান্য নয়, এবং তার রূপটিরও নির্দেশ তিনি দিয়েছেন অতি মুখর ও প্রাঞ্জল ইঙ্গিতে, কখনো তাঁর নিজের কবিতার মধ্য দিয়ে সরাসরি, কখনো বা বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনে, কখনো আবার কাব্য সম্বন্ধে তাঁর লেখায়। তবে যেহেতু দেশভেদে রীতিভেদ হয়ে থাকে, তাঁর কবিতার আত্মাটিই বা সে বিষয়ে তাঁর বক্তব্যই বিদেশীদের পক্ষে আলোচ্য বিশেষ করে। কবিতার এই আত্মার দিকটারও বিস্তারিত আলোচনা তিনি করেছেন বিচ্ছিন্নভাবে, বিশেষ করে তাঁর "Prose a des Esseintes" নামক বিখ্যাত নিবন্ধে। এসবের অনেকখানিই বেশ দুর্বোধ্য, প্রায় অবোধ্য, যেমন বহুলাংশে তাঁর সমস্ত কবিতাও। তবু চেষ্টা করলে সর্বত্রই একটি প্রধান সরল রেখার অগ্রগতি ধরতে পারা যাবেই।

শেষ পর্যন্ত, মালার্মে নিজেকে ততটা কবি বলে মেনে নিতে চাননি, যতটা তিনি হতে চেয়েছিলেন কাব্য-দার্শনিক। সংগীতের প্রতি, বিশেষ করে ভ্বাগনারের সংগীতের প্রতি, তাঁর প্রীতি ছিল প্রচণ্ড। শেষ জীবনে তো লেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে সংগীত রচনাতেই মন দেবেন স্থির করেছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন যে অক্ষর বা অক্ষরে বিবৃত ছবির যে প্রতীক তা নিম্নস্তরের, তাই চেয়েছিলেন সংগীতের নগ্নতর, শুদ্ধতর

প্রতীকের ব্যঞ্জনায় ''ভাবটির'' আরও কাছে এগিয়ে যেতে। সারাজীবন ক্ষুরধার বুদ্ধির এই সাধনায় তাঁর কবিতাকে হতে হয়েছে অনিবার্যভাবে দুর্বোধ্য, তা প্রাণপণ প্রয়াস ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও প্রকাশ করতে নিশ্চয়ই পারেনি সেই এক ও গুপ্তের অদ্বিতীয়কে, শুধু তার মুখে অজস্র চিহ্ন অমানুষিক এক আকাঙ্ক্ষার, অলৌকিক এক হতাশার। ব্যক্তিগত জীবনেও মালার্মে যেন পাগল হতে চলেছিলেন ধীরে ধীরে।

এই শুদ্ধ বুদ্ধির সাধনায়, সেই অলৌকিক, ঐশ ভাবটিকে ধরতে চেয়ে, মালার্মে একটি শৃঙ্খলার তত্ত্বকেও খাড়া করেছিলেন যা' আর মানতে চাইল না তথাকথিত অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যকে। অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের অনুপ্রেরণায় নয়, ''তা'' মিলবেই মিলবে নিশ্চল নির্ভুল সাধনায়। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি : ''যে মানুষ চিন্তাশীল সাধক, সে নির্বাসিত কখনো নয় সেই অসম্ভব সুযোগের সম্ভাবনা হতে।'' মালার্মের আগেও, কবিতায় অনুপ্রেরণার মূল্যটি কতটুকু বা কতখানি বা তার কোনও মূল্য একেবারেই আছে কিনা, তাই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। অনেকেই হতে চেয়েছেন সাধক, অনুপ্রেরণার দাক্ষিণ্যের ভিখারী নয়। এমনকি বোদলেয়ারকেও বলতে শোনা গেছে : ''পারা কি যায় না যে কোনো মানুষকে লিখতে, মাত্র বিশটি সন্ধ্যার শিক্ষায়, একটি নাটক যা' অন্য কোনো নাটক হ'তে কোনোদিক দিয়ে বেশি হাস্যকর হবে না, অথবা তাকে লিখতে যে কোনো দৈর্ঘ্যের একটি কবিতা যা' কিছু কম স্বাদহীন হবে না অন্য যে কোনো আজো অপঠিত এপিকের চেয়ে? বিশেষ ক'রে সেই শিক্ষায় যদি তাকে আমি দিতে পারি আমার তত্ত্বদৃষ্টি ও বিজ্ঞান?''

মালার্মের সেই শুদ্ধ বুদ্ধির সাধনার ধারাটি আজো নেমে এসেছে কাব্যে ও শিল্পে। অনেকগুলির মধ্যে হতে আমি বেছে নিলাম আজো জীবিত ও ফ্রান্সের এক অতি মাননীয় শিল্পী ব্রাকের এই উক্তিটি : ''চিত্রের বিষয় কখনোই তা' নয় যা' আপাতভাবে তা' দেখাতে চাইছে — তার প্রকৃত বক্তব্য একটি নতুন ঐক্য, একটি গীতিমুখর গতির বিকশিত চেতনা, যা' সম্ভব হয় একমাত্র শৃঙ্খলার সাধনায়। আমি তাই যা' চাই তা' নিয়ম ও শৃঙ্খলা, যা' আবেগকে ধরে রাখে ও তাকে বাঁধে।''

ভেরলেন ও মালার্মে দুজনেই বিদ্রোহ করেছিলেন তৎকালীন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিগত দুটি বিভিন্ন পথে। র‍্যাঁবোর বিদ্রোহ আবার ধরল আরো একটি পথ, সে বিদ্রোহ এমন একটি রূপের ও এত প্রচণ্ড একটি আন্তরিকতায় যে তার তুলনা কোনো সাহিত্যে নেই। কবি হিসেবে ভেরলেন ছিলেন গৌণ, আমি তো বলব নিতান্তই গৌণ, ও মালার্মের কবিতা অতি উচ্চ স্তরের হলেও তিনি মূলত হতে চেয়েছিলেন কাব্য-দার্শনিক। র‍্যাঁবো জগতের এক মহত্তম কবি, এবং তা-ই তাঁর প্রধান পরিচয়। এবং তাঁর জীবনেরও আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য দিকটা আছে, যা' তাঁর কাব্যকে আরো মহিমামণ্ডিত করেছে। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন তৎকালীন সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ও চিন্তাধারায় সকল গৃহীত সত্যের বিরুদ্ধে, তাঁর দুয়েকজন স্বনামধন্য পূর্বসূরীর মতই প্রাণপণে তৈরি করতে চেয়ে একটি নতুন জগত, নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে। প্রথম হতেই দেখতে পেয়েছিলেন জীবনে সেই বস্তুটাই অনুপস্থিত রয়ে গেছে যা' অর্থ দেয়, সঙ্গতি ও সুষমা দেয় জীবনকে। বুঝেছিলেন ''আমাতে'' ''আমি'' নেই, ''আমি'' একটা স্বতন্ত্র জিনিষ যাকে কবিরা চিনে উঠতে পারেনি — চেয়েছিলেন ''দ্রষ্টা'' হতে, দৃষ্টি দিতে। মালার্মের মত তিনিও জাগতে চেয়েছিলেন যাদুকরী শক্তির চেতনায়, কিন্তু বেশ একটু অন্যভাবে। মালার্মের ''ভাব'' ও শুদ্ধ বুদ্ধি হতে র‍্যাঁবোর সাধনার পার্থক্য অনেক। তাঁর আসা ও চলে যাওয়া ফরাসি কাব্যে ঘটল যেন উল্কার মত — একথা মালার্মেই বলেছিলেন। এ ছাড়া, অন্য অনেকে র‍্যাঁবোকে আখ্যা দিতে চেয়েছেন দানবের, বা দেবদূতের, বা মাত্র মরজগতের একজন মানুষের। কেউ কেউ এই তিনটি আখ্যা একেবারে একই সঙ্গে দিয়েছেন, যা' প্রমাণ করে র‍্যাঁবো সম্বন্ধে প্রহেলিকার প্রচণ্ডতা।

র‍্যাঁবোকে নিয়ে বাংলাদেশে বহু বিস্তারিত আলোচনা হয়ে গেছে, আমি নিজেও দুয়েকবার তাঁর সম্বন্ধে

বলবার চেষ্টা করেছি। এখানে তাই মাত্র একটি-দুটি প্রয়োজনীয় কথা তাঁর সম্বন্ধে বলছি, ভেরলেন ও মালার্মের আলোচনার সূত্র ধরে, কারণ ভেরলেন-মালার্মে-র‍্যাঁবো, এঁরা তিনজন ফরাসি প্রতীকবাদী কবিতার ত্রিমূর্ত্তি বলে পূজিত।

বয়সে মালার্মে হতে বারো বছরের এবং ভেরলেন হতে দশ বছরের ছোট ছিলেন র‍্যাঁবো, ও তিনি মারা যান এই দুই অগ্রজ হতেই বেশ কিছু আগে। তাছাড়া, যা' লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সীমা মাত্র প্রথম কুড়ি-একুশ বছরের মধ্যে বিধৃত। এরি মধ্যেই জ্বালিয়ে যেতে পারলেন এমন একটি আগুন যার নতুন নতুন বহ্নিশিখা আজো জাগছে দেশে-দেশান্তরে। এ ছিল তাঁর অন্তর্জাত বোধির আগুন, মালার্মের ক্ষুরধার শুদ্ধ বুদ্ধির আগুন নয়। তাঁর অসন্তোষ ও ঘৃণা, প্রথমে নিজের পরিবেশের প্রতি, পরে তৎকালীন কাব্যের প্রতি, ও আরো পরে সকল সাহিত্যের ও এমন কি নিজেরও প্রতি, ক্রমবর্ধমান আয়তনে অচিরেই এমন পৈশাচিক আকার নিল যে ঠিক যে সময়টিতে মনে হচ্ছিল তিনি পেতে চেয়েছিলেন সেই পরম দরজার সত্য চাবিটি, তিনি ছিটকে বেরিয়ে গেলেন কাব্য-সাধনার অন্তর হতে, আত্মবিলুপ্তির শেষ মন্ত্রটি পূজারীর সমস্ত আন্তরিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করে দেশান্তরী হলেন এক সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনযাপন করতে। কিন্তু তার একটু আগেই, পরবর্তী সমস্ত রসপিপাসুদের কথা স্মরণ করে' যেন, হাত দিয়েছিলেন একটি নতুন পরীক্ষায়। র‍্যাঁবো সেই পরীক্ষায় যেন ধরতে চেয়েছিলেন অব্যক্তকে হাতের মুঠোয়, তাকে নিজের যাদুকরী শক্তিতে প্রকাশ করতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি চাইলেন একটি নতুন শব্দের রসায়ন, সৃষ্টি করতে নতুন ভাষা, পেতে নতুন করে দেখার ক্ষমতা। তাঁর ''দ্রষ্টার'' চিঠিতে বললেন, ''কবিকে এবার ''দ্রষ্টা'' হতে হবে, ও সে তা হতে পারবে একমাত্র সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতির এক দীর্ঘ, প্রচণ্ড ও বুদ্ধির বিপরীত উজানযাত্রায়।'' তিনি ভাবলেন, জীবনকে একেবারে উল্টে দেবার রহস্যটিকে যেন তিনি ধরতে পেরেছেন।

জন্ম মফস্বল শহরে — প্রথম হতেই কৃতী ছাত্র ও কবিতা রচনায় অসম্ভব প্রতিভাশালী। ছোট শহরের তুচ্ছতা, অর্থহীনতা, মর্মন্তুদ নির্বেদ ও বিষণ্ণতাকে যেন তীরবিদ্ধ মৃত শিকারের মতো ফেলে দিয়ে ছুটলেন তিনি পারীতে সেই ''নতুন জীবনের'' অনুসন্ধানে। রুক্ষ উস্কোখুস্কো চুল, সহজিয়া এক ভবঘুরের ভাব, চোখ দিয়ে যেন আগুনের জ্যোতি ঠিকরে বেরোচ্ছে। এই রূপেই ভেরলেন র‍্যাঁবোকে প্রথম দেখেন, পারী-কাম্যুনের যুগ।

কিন্তু র‍্যাঁবোর সেই আগুন হাজার সাধনা করেও পেল না শান্তি, জমা করল শুধু মরিয়া এক নৈরাশ্য। সেই নৈরাশ্যের মধুর ও বহ্নি-চেতনার স্বাক্ষর তাঁর সমস্ত কাব্য — কী ''মাতাল তরণীতে'' কী অনবদ্য ''স্বরবর্ণ'' সনেটটিতে, কী ''নরকে এক ঋতুতে'', কী ''দীপাবলীতে''। আশ্চর্য ছবির জগত এই, ও এ এক আশ্চর্য সাধনার জবানবন্দী।

এক জায়গায় লিখছেন র‍্যাঁবো ''নরকে এক ঋতুতে'' :

> ''আবার আমি। আমার মূর্খতার আরো একটি কাহিনী। বহুদিনের গর্ব আমার, সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত নিসর্গ শোভার ওপরই আছে আমার দখল — আধুনিক কাব্য ও চিত্রকলায় গগনস্পর্শী খ্যাতির আড়ালে জেনেছি তার চূড়ান্ত অসারতা।...বার করেছি স্বরবর্ণের রঙ — আ কৃষ্ণ, অ শ্বেত, ই রক্ত, ও নীল, উ সবুজ — নিরূপণ করেছি প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের গতি-প্রকৃতি। আর সহজাত প্রেরণার ছন্দেই আজ আবার লালায়িত হয়েছি কাব্যিক এমন একটি সুগম শব্দ আবিষ্কার করতে যা' একদিন না একদিন প্রযোজ্য হতে পারবে সমস্ত অর্থে। এই আমি অনুবাদের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করে রাখলাম। প্রথমে সে ছিল শুধু সমীক্ষণ। রূপ দিয়েছি মৌনকে, বাণী দিয়েছি রাত্রিতে, লিখে গেছি অনির্বচনীয়কে — স্থৈর্যে বেঁধেছি চিরচঞ্চল

> ঘূর্ণিকে।...আমার শব্দের এই রসায়নে কাব্যের যত পুরোনো ভাঙ্গাচোরা জিনিষের ভূমিকা। নিজেকে সইয়ে নিয়েছি সরল মতিভ্রমে — সত্যি, দেখেছি আমি কারখানার জায়গায় মসজিদ, দেবদূতের পরিচালনায় যন্ত্র-সঙ্গীতের বিদ্যালয়, আকাশ পথে শকটের মিছিল, হ্রদের গভীরে বৈঠকখানা; কত যে দৈত্য, কত রহস্য। কী এক প্রহসনের নাম চোখে আমার বিভীষিকা ঘনিয়ে তুলেছে। এ ছাড়া শব্দের ছায়াবাজিতে বুঝিয়েছি কুহকের যত কূটতর্ক। অবশেষে আমার চেতনায় এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে খুঁজে পেলাম পবিত্রকে। তৃষ্ণায় ছটফট করেছি, আক্রান্ত হয়েছি প্রবল জ্বরে — ঈর্ষা করেছি পশুর সুখ, শুঁয়োপোকার নিরপরাধ বিস্মৃতি লোক, গন্ধ-মূষিকের কৌমার্যময় তন্দ্রা। তিক্ততায় ছেয়ে গেল আমার চরিত্র — কয়েকটা গাথার মত কবিতায় পৃথিবীকে বিদায় জানালাম।...অপূর্ব এক আজগুবি গীতিনাট্য হয়ে বসেছি।"

এ শুধু ছবির জগতেই নয়, অপ্রকাশ্য এক নৈরাশ্যের মর্মবাণীই নয়, এ এক আলাদা জগত যা' র‍্যাঁবো তৎকালীন ও পরবর্তী কবিতায় সঞ্চারিত করলেন। ''নরকে এক ঋতু'' শুধু কবিতাই নয়, একদিক দিয়ে কবির জীবনবাণীও। এছাড়াও, কবিতা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সরাসরি তিনি বলেছেন ''দ্রষ্টার'' চিঠিতে ১৮৭১ সালে, যে চিঠির আলোচনায় আগামীর কবিতা কম প্রেরণা পায়নি।

''আজ জানি কী করে সুন্দরকে নমস্কার করতে হয়'' — এ কথা বললেও র‍্যাঁবো জানতেন তাঁর দম্ভ মিথ্যা; তিনি জানতেন : পাওয়া গেল না। তাই, শুধু এই আশা রেখেই তিনি চিরবিদায় নিলেন কবিতা হতে : ''ভোরবেলা ধীর আগ্রহে সম্পন্ন হয়ে আমরা পৌঁছব আশ্চর্য নগরীতে।''

এই আশা, এই অর্থে, চিরকালের কবিতার, যে কবিতা আজকেরও, আমাদেরও। গত শতাব্দীর শেষার্ধের এই তিনজন কবি নানাভাবে পাথেয় জুগিয়েছেন পরবর্তী কবিতার যাত্রায়। তাঁদের বার বার আলোচনার তাই একটি বিশেষ সংগতি আছে আজকের কাব্যিক পরিস্থিতিতে, ও বাংলাদেশেও। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তাঁদের সব কথা আমি নিশ্চয়ই বলতে পারিনি — শুধু যা' দেখাতে চেয়েছি, তা' তাঁদের সাধনার কয়েকটি স্ফুলিঙ্গ। তাঁদের কবিতা বা ছবির জগতের চেতনায় আমরা বৃথাই উদ্বুদ্ধ হতে চেষ্টা করব আজ, যদি না একই সঙ্গে বুঝতে চাই পিছনের সেই আজীবন সাধনাটির, যদি না নমস্কার করতে পারি তাকে।

প্রবন্ধটি উত্তরসূরি পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত। অনুপ মতিলালের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

লোকনাথ ভট্টাচার্য : (৯ অক্টোবর ১৯২৭ - ২৩ মার্চ ২০০১) কবি, গবেষক, ফরাসি ভাষার বিশেষজ্ঞ ও অনুবাদক। তিনি ফরাসি কবি আর্তুর র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী' ও 'নরকে এক ঋতু' বাংলায় অনুবাদ করে খ্যাতি লাভ করেন।